পরিবেশ ও জলবায়ু বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

জুন, ২০২৩

প্রসঙ্গ

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ক্রি আদিবাসীদের একটি প্রবাদবাক্য রয়েছে, যেটিকে বাংলা অনুবাদ করলে অর্থ দাড়ায়- "যখন আর একটাও গাছ বেঁচে থাকবে না, যখন সবগুলো নদীর পানিই বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর শেষ মাছটাকেও আমরা ধরে ফেলবো- কেবল তখনই হয়তো আমাদের মাথায় আসবে যে, টাকা খেয়ে পেট ভরে না।" প্রকৃতি-প্রতিবেশের প্রতি উদাসীন ভোগবাদিতার বিস্তার দেখেই হয়তো মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন আশঙ্কার কথা বলে গেছেন ক্রি আদিবাসী চিন্তকেরা। আজকের বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে বহু আগে বলে যাওয়া এই কথাগুলোর যথার্থতা ধীরে ধীরে টের পাওয়া যাচ্ছে। টাকার লোভে প্রকৃতি-প্রতিবেশ ধ্বংস করা যে ভুল পথ- তা আমরা আজ বুঝতে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যাচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্যবোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকারের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য।" বা "লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে।" তাই তো প্রকৃতি-প্রতিবেশকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য বরং টাকা খরচ করা নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনেরা বিভিন্ন মাত্রায় ভাবিত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষাপটেই বাজেট তথা সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনায় প্রকৃতি-প্রতিবেশের জন্য কতোটা বরাদ্দ রাখা হলো তার যথার্থতা, যথেষ্টতা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন নীতি সংলাপ এবং আলোচনা চলমান রয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে সরকার বাজেটে প্রকৃতি-প্রতিবেশের সুরক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা দিচ্ছে তা সরকারের বাইরে থাকা অংশীজনদেরকেও এক রকম নির্দেশনা দেয়। সে বিচারে বাজেটে প্রকৃতি-প্রতিবেশের বরাদ্দ সরকার ও সরকারের বাইরে থাকা সকল অংশীজনের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাজেট ২০২৩-২৪-এ প্রকৃতি-প্রতিবেশ

এবারের বাজেটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু খাতে ১ হাজার ৬৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৫০১ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ খানিকটা কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা। এবারের প্রস্তাবনায় উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে ৮৫১ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ৭৮৮ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে পরিবেশ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ দেখলেই চলবে না। নিঃসন্দেহে এটি বহুমাত্রিক তথা আন্ত:ঘাত সম্পর্কিত বিষয়। অন্তত: পঁচিশটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ও জলবায়ুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সে কারণে অর্থমন্ত্রণালয় এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পরিবেশ ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট যে সব কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ থাকে তা সম্মিলিত করে টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বলে একটি আলাদা প্রকাশনাও করে থাকে। ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি এবার বাজেটের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় পরিবেশ

চিত্র ১: বাজেট ২০২৩-২৪-এ পরিবেশ ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের উপখাত-ওয়ারি বণ্টন

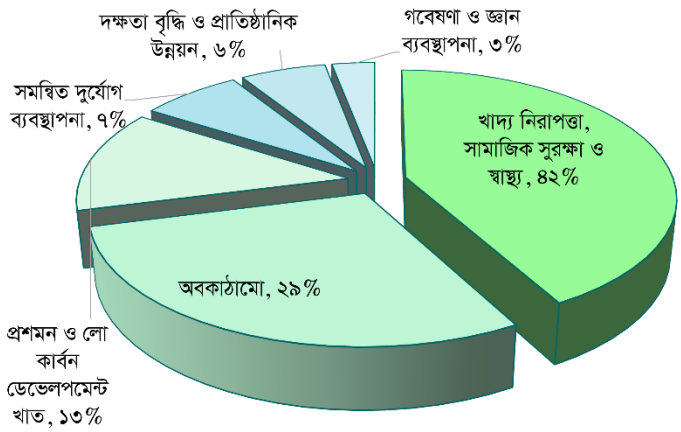

সূত্র: বাজেট ডকুমেন্টস, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট এই বরাদ্দ মোট বাজেটের ৮.৯৯ শতাংশ । সংশোধিত বাজেটের চেয়ে এই বরাদ্দ ০.৪৫ শতাংশ কম। এই বরাদ্দের ৪২ শতাংশ খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, ও স্বাস্থ্য খাতে। ২৯ শতাংশ অবকাঠামো খাতে, প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট খাতে ১৩ শতাংশ এবং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দেয়া হয়েছে ৭ শতাংশ।

এই বরাদ্দে বাংলাদেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নানা কৌশল-ভিত্তিক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণের অর্থায়ন প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর এই চ্যালেঞ্জ আসছে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় উৎস থেকে। তাই বাজেটে দেশি বিদেশি উভয় উৎসের অর্থায়নের হিসেব দেয়া হয়। বিশ্বজুড়ে যে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে তার জন্য বাংলাদেশ সামান্যই দায়ি। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউনেপ) এক হিসেব থেকে জানা গেছে যে একজন ইউরোপীয় নাগরিক ১১ দিনে যে পরিমাণ কার্বন নিঃস্বরণ করেন তা বাংলাদেশের একজন নাগরিক এক বছরেও করে উঠতে পারেন না। অথচ মূলত এই বিশ্ব উপদ্রবকে মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও মানুষকে প্রতিনিয়ত আরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার নিম্ন আয়ের পরিবারকে তাদের সামান্য আয়ের বড় অংশই খরচ করতে হয় এজন্যে। আর সে কারণেই শুধু পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ওপর এতো বড় সমস্যা মোকাবিলার দায় না চাপিয়ে সম্মিলিতভাবে তা মোকাবিলা করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। এখাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কতোটা খরচ করছে তার একটি হিসেব বাজেটের সময় দেয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, বিশ্ব পরিসরে আলাপ আলোচনার জন্য সরকারের এই সম্মিলিত নীতি কৌশল খুবই প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। তবে সত্যি সত্যি এই অর্থায়ন পরিবেশ সংরক্ষণে কতোটা সফল ভাবে খরচ করা হচ্ছে তা নিরন্তর অবলোকনের নিশ্চয় সুযোগ রয়েছে। সরকার ও সমাজ উভয়েরই এই দায় রয়েছে। এবারের পরিবেশ ও জলবায়ু বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- 'টেকসই ক্রয়নীতি'র আওতায় পরিবেশ ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক করা।
- ৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের প্রকল্পের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণকে বাধ্যতামূলক করা।
- বায়ু দূষণ কমাতে নির্দিষ্ট সিসির ওপর নির্ভরশীল একাধিক গাড়ির মালিকানার ওপর সারচার্জ বসানো।
- ২০০৯ সালে চালু বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার সবুজ অর্থায়ন (পরবর্তীতে ৪০০ কোটি টাকা) তহবিল (আবর্তনমূলক) থেকে বায়োগ্যাস, সৌর জ্বালানি এবং ইটিপি বাবদ অর্থায়ন অব্যাহত রাখা।
- শুধুমাত্র সোলার ইনভার্টার প্রযুক্তির ওপর ১ শতাংশ কর কমানো হয়েছে। সোলার মডিউল, সোলার ডিসি, সোলার মাউন্টিং স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্লিনিং ওয়াকওয়ের ওপর কর আগের মতোই রয়েছে (২৬%-৫৮%)।
- সোলার পাওয়ার পরিচালিত লবণাক্ত পানি পরিশুদ্ধ করার প্ল্যান্টের ওপর অগ্রিম কর তুলে নেয়া।

জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশের একটি। একই সঙ্গে গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে এ দেশটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৌড়ে সবচেয়ে গতিময় দেশেরও একটি। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন এবং ভূমিধ্বস এই দেশটির এই গতিময় উন্নয়নযাত্রাকে প্রায়ই চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দেয়। আর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে দীর্ঘমেয়াদে সমুদ্রের পানির লেভেল বেড়ে কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা তো রয়েছেই। পুরো সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ জলবায়ুর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই বেঁচে আছেন। তাছাড়া, গত দুই দশকে বাংলাদেশেও কার্বন নিঃসরণের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ জনগণের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রাকে সচল রাখাও জরুরি। এ জন্যে জ্বালানির যে চাহিদা বাড়ছে তা মোকাবিলা করাটাও বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে। আবার বাস্তুচ্যুত হয়ে নগরমুখি মানুষের চাপে সুপরিকল্পিত নগরায়নও সহজ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে নগরের সাধারণ মানুষের জন্য বাসস্থান, পরিবহন, স্যানিটেশন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক সংহতি ও শান্তি নিশ্চিত করাও বেশ কষ্টকর।

চিত্র ২: জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কিছু উদ্যোগ

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ তার Nationally Determined Contribution, NDC সংশোধন করেছে

জলবায়ু-সহিষ্ণু ধান, গম, ডাল ও সবজির বীজ আবিষ্কার, গভীরতর গবেষণায় আর্থিক সহায়তা এবং বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইনের খসড়া অনুমোদন

বাংলাদেশের সরকার ও জলবায়ু চ্যাম্পিয়ান অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ও সক্রিয় ব্যক্তিরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আলোকে তার Nationally Determined Contribution (NDC) সংশোধন করে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও স্বল্প কার্বন নিঃসরণমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই নয়া NDC-তে শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ, বর্জ্য, কৃষি, বন, এবং অন্যান্য ভূমি ব্যবহারের টেকসই কৌশল গ্রহণের অঙ্গিকার করেছে। প্রতিটি 'কপ' সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বিশ্ব মঞ্চে জলবায়ু অর্থায়নের নানা দিক নিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, সকল জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্যই তাঁরা এই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আশার কথা বাংলাদেশের জলবায়ু-বান্ধব উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা ছাড়াও দেশের ভেতরের অ-সরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্নধর্মী সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সরকার ও সমাজের সাথে অংশিদারিত্ব গড়ে তুলেছে। তবে সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু অর্থায়নের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি যোগান দিয়ে যাচ্ছে। বাদ বাকিটা বিদেশ থেকে আসছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেসব থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এখনও পর্যন্ত বেশ জটিলই রয়ে গেছে। তাদের প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থছাড় সহজ করার জন্য আমাদের চাপ অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। রোহিঙ্গা

শরণার্থী সঙ্কটে আমাদের পরিবেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিদেশি অর্থায়ন প্রক্রিয়া মোটেও সহজতর হচ্ছেনা।

বাংলাদেশের সরকার ও সমাজ তাদের সাধ্যমতো জলবায়ু মোকাবিলায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে কৃষি উৎপাদন যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো জলবায়ু-সহিষ্ণু ধান, গম, ডাল ও সবজির বীজ আবিষ্কার করে তাদের গবেষণা সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে আরও গভীরতর গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দেবার প্রয়োজন রয়েছে। এবারের পরিবেশ বাজেট গবেষণা বাবদ বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে। এই বরাদ্দ উপযুক্ত গবেষণা করে কতোটা ব্যবহৃত হচ্ছে, তা পরের বছরের বাজেটে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পায়ন ও উন্নয়নের চাপ থেকে কৃষি জমি রক্ষা করাটাও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যেই পড়ে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ সভায় বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইনের খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।

আগে যে সব এলাকা থেকে মাটি বা বালু তোলা নিষিদ্ধ ছিল, তার মধ্যে ফসলি জমি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন ফসলি জমিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কোনো ফসলি জমি থেকেও মাটি ও বালি উত্তোলন করা যাবে না। নদী পথের নাব্যতা বিনষ্ট হতে পারে এ রকম হুমকি থাকলে বালু বা মাটি তোলা যাবে না। আর বালি পরিবহনের কারণে কোনো রাস্তা বা স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা পরিশোধ করবেন ইজারাদার। আর ইজারা কার্যক্রম অনলাইনে হবে। নিঃসন্দেহে এটি পরিবেশ-বান্ধব একটি উদ্যোগ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পরমাণু জ্বালানি কমিশন ন্যানো টেকনোলজি গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্যে পর্যাপ্ত অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা বলাই যায় যে, এই কমিশনের বিজ্ঞানীরা প্রবাসী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা নিয়ে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পারলে যে সব খনিজ ও জলীয় পদার্থের কারণে আমাদের জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হচ্ছে তার কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিশা পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সরকার, নাগরিক সংগঠন মিলেই জলবায়ু চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে 'রেজিলিয়েন্স' বা আত্মশক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে যেতে হবে। সেজন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণার সুযোগ ও তহবিল আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। আশার কথা তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। নিরাপদ পরিবেশ সম্মত খাদ্য গ্রহণেও তাদের আগ্রহ প্রচুর।

বিশ্ব পর্যায়ে কার্বন নিঃস্বরণের মাত্রা কমানো, অভিযোজন প্রকল্পগুলোর জন্য বাড়তি অর্থায়ন এবং সম্প্রতি অনুমোদিত Loss and Damage Fund থেকে প্রাপ্য হিস্যা আদায়ে আমাদের আরও বেশি সক্রিয় থাকতে হবে। আমরা জলবায়ু চ্যালেঞ্জের শিকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণ করতে বেশি আগ্রহী। এ বিষয়ে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারটি প্ল্যান', বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ অনেকগুলো সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা আমাদের হাতে রয়েছে। এসব পরিকল্পনার আলোকে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিতে বিশ্বজলবায়ু তহবিল ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাড়তি অর্থায়ন চাই। জলবায়ুর আঘাতে সবচেয়ে বিপর্যস্ত এক দেশ হল বাংলাদেশ। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২৭ বছরের ২৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের দরকার হবে। তাপমাত্রা যদি দুই ডিগ্রি (২°) সেলসিয়াসের ওপরে উঠে যায় তখন এর চেয়েও বেশি লাগতে পারে এই বিনিয়োগ।

নবায়নযোগ্য শক্তিতেই ভরসা রাখছে বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে জ্বালানি সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য বাস্তব সম্মত উদ্যোগের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকল্প কিছু নেই। তবে এই মূহুর্তে প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য মিলেই একটি blended approach-নিয়েই পথ চলতে হবে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় স্বার্থান্বেষী মহলের অতিলোভে জ্বালানি ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। ফলে এই খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রয়োজনীয়

বিনিয়োগে সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থায় তাই সরকার ও সমাজের আগ্রহ বাড়ছে। অর্থাৎ কেবল প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানিতেই সমাধান মিলবে- এ ধারণা ভুল। ম্যাক্রো অর্থনীতির বাস্তবতায় এই কৌশলকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে ২৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মতো সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে । কিন্তু প্রাথমিক উপকরণের (গ্যাস ও তেল) অভাবে আমরা এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছি না। এ জন্য যে বিদেশি মুদ্রার প্রয়োজন হবে তার সংস্থান কতোটা সম্ভব হবে তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

তাহলে আমরা পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের দিকে আরও জোরালো উদ্যোগ কেন নিচ্ছি না? বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পাবার পরিকল্পনা করেছিল। বাস্তবে এখনও আমরা মোট জ্বালানির ২ শতাংশের বেশি সবুজ জ্বালানি উৎপাদন করতে পারছিনা। তবে এখন প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এখন আর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এতো জমির দরকারও হয় না। আর আমাদের ফ্যাক্টরি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদসহ যতগুলো কমিউনিটি স্থাপনা আছে সেসবের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করলে চার হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব বলে সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে ব্রাইট গ্রীন এনার্জি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া জানিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে গাজিপুরের কাশিমপুরে একজন উদ্যোক্তা বিশ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করে ৩৫ লাখ কিলো-ওয়াট আওয়ারের বেশি সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। বাজার থেকে কিনলে তার দাম পড়তো ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। আগামী ৬.২৩ বছরেই তাঁর পুরো বিনিয়োগ উঠে আসবে। একটি নিটিং ফ্যাক্টরিতে এটা সম্ভব হলে পুরো দেশে কেন নয়?

আমাদের এখন নেট মিটারিং ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থায় সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২০-২৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতে পারলে ঢাকাসহ পুরো দেশেই বাড়ির ছাদ ও খোলা জায়গায় সোলার প্যানেলে ছেয়ে যেতো। তবে উচ্চমানের প্যানেল আমদানি ও উৎপাদনের জন্য যে ধরনের বাজেটারি সহায়তার প্রয়োজন ছিল তা থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে। এখনও এসব যন্ত্রপাতির ওপর ২৬ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। কার্যত এগুলো করমুক্ত হওয়া উচিত। অথচ 'মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান' অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ৪০ শতাংশই নবায়নযোগ্য করে ফেলা হবে। কিন্তু বর্তমান বাজেট সেই লক্ষ্য পুরনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ইঙ্গিত নেই।

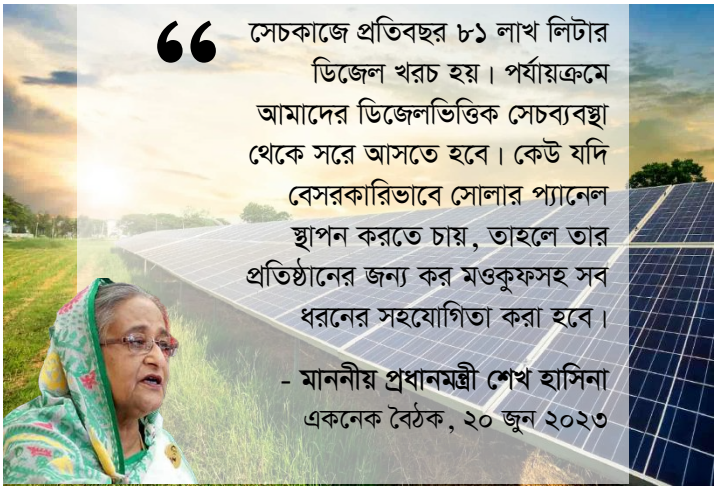

তবে দেশের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার নীতি-নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সেচের জন্য জীবাশ্ব জ্বালানি থেকে সরে এসে পুরোপুরি নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ একনেক বৈঠকে। তিনি বলেছেন- "সেচকাজে প্রতিবছর ৮১ লাখ লিটার ডিজেল খরচ হয়। পর্যায়ক্রমে আমাদের ডিজেলভিত্তিক সেচব্যবস্থা থেকে সরে আসতে হবে। কেউ যদি বেসরকারিভাবে সোলার প্যানেল স্থাপন করতে চায়, তাহলে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য কর মওকুফসহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।" আশা করি যায় বাজেট প্রণেতারা তাঁর এই নির্দেশনা অনুযায়ী নতুনভাবে পরিবেশ ও জলবায়ু বাজেটের বিষয় নিয়ে ভাববেন।

জ্বালানি ছাড়াও আমাদের পাবলিক পরিবহনে বড় সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। মেট্রোরেল নিঃসন্দেহে পরিবেশবান্ধব। কিন্তু এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের বাস ও অন্যান্য পরিবহন সার্ভিসকে কতো দ্রুত আধুনিক ও সমন্বিত করতে পারবো তার ওপর সবুজ নগরায়নের অনেকটাই নির্ভর করবে। যে সব পরিবহন বায়ু দূষণ করছে তাদের ওপরও কার্বন কর চালু করা যায়। তবে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যের অপর্যাপ্ততাও যথেষ্ট। বিবিএস এখন ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাকউন্টিং এর মূল্যমান নির্ধারণের জন্য কাজ করছে। আমাদের সুন্দরবন যে কতো মূল্যমানের 'কার্বন সিঙ্ক' বা প্রাকৃতিক অবকাঠামো, এই হিসেবায়ন থেকে তা জানা যাবে। নতুন করে কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে যাতে আরও ঝুঁকি তৈরি না হয় সেদিকটায় বিশেষ নজর দিতে হবে। আর সেজন্যেই এই প্রাকৃতিক সম্পদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সবশেষে, ঝুঁকি তৈরি করছে যে খাত এবং তা মোকাবিলার চেষ্টা করছেন যে প্রতিষ্ঠান– তাদের মধ্যে আরও গভীর সমন্বয় অপরিহার্য। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার ও নাগরিক উদ্যোগগুলোর মধ্যে বাড়তি সংযোগ ও সমন্বয় করাও জরুরি। সম্প্রতি ছাদ বাগান থাকলে বাড়ির ওপর স্থানীয় সরকারের কর থেকে ১০ শতাংশ কম নেবার সিদ্ধান্তটি এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই চালু করা গেছে। এভাবেই আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে আরও অনেক কাজ করতে পারি।

কিছু নীতি-প্রস্তাবনা

উপরোক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা আগামী দিনে বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনা করা যেতে পারে।

- পরিবেশ ও জলবায়ু বাজেটের অংশ হিসেবে গবেষণা খাতে বরাদ্দ গত অর্থবছরের চেয়ে খানিকটা বেড়েছে (+১৮২ কোটি টাকা)। এর পরিমাণ আরও বাড়ানো উচিত। এই বরাদ্দ থেকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানীরা যাতে খুব সহজেই অনুদান পেতে পারেন সেজন্য প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি জুরি বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

- 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' প্রকাশনাটি যেন অব্যাহত থাকে। কেননা পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের একার কাজ নয়। সত্যি সত্যি এই অর্থায়ন কিভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে তারও একটা প্রতিবেদন বাজেটে থাকলে ভালো হয়।

- টেকসই নগরায়নের দিকে আরও নীতি মনোযোগ দিতে হবে। নগরের বাড়ির ছাদে নির্ভরযোগ্য সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদকদের পর্যাপ্ত বাজেটারি প্রণোদনা দেয়া হোক। নেট মিটারিং ব্যবস্থায় সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারিদের জন্য ২০-২৫ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে প্রতিটি ছাদে সৌর প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা যাবে।

- সামগ্রিকভাবে কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যবস্থায় রাসায়নিক সারের পরিবর্তে অর্গানিক কৃষি ব্যবস্থায় উৎসাহিত করার জন্য জৈব সার উৎপাদনে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। তবে এক্ষেত্রেও বাস্তবতার নিরিখে অজৈব ও জৈব সারের সম্মিলন ঘটিয়ে এগোতে হবে।

- কৃষিতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে বিশেষ করে সোলার ইরিগেশন পাম্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি, সুদে ভর্তুকিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রণোদনাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্পকে নিরুৎসাহিত করা এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া। কৃষি জমি ও জলাধার সংরক্ষণের স্বার্থে বড় ও একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট বা প্লট ক্রয় নিরুৎসাহিত করার জন্য এলাকা ভিত্তিক ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ করা। ভূমির মূল্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এমন নীতি, যেমন হাউজিং নীতিমালায় প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান করার জন্য 'একাধিক নয়' এই নীতি অনুসারে বাসস্থান, ফ্ল্যাট ও প্লটের প্রগ্রেসিভ হারে ট্যাক্স নির্ধারণ করা। প্রয়োজনে একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট বা জমির মালিকদের আয়কর আরও বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের উপকূলসহ কিছু কিছু স্থানে বায়ু বিদ্যুত উৎপাদনেরও সুযোগ রয়েছে।

- তামাক উৎপাদিত জমির সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি এর বিপণনে নিরুৎসাহিত করার মত বিশেষ শুল্ক ভ্যাট, ট্যাক্স আরোপ করা।

- বর্জ্য পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট (ETP) অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য প্রকল্প বরাদ্দ রাখা। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তৈরির যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে তার ব্যাপক বিস্তৃতি কাম্য। এজন্যে প্রয়োজনে বাজেটারি ভুর্তকি বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।

- প্লাস্টিকের ব্যবহার নিরুসাহিত করার জন্য উচ্চহারে কর আরোপের বিধান করা। পাশাপাশি চক্রাকার অর্থনীতি (Circular Economy)-এর অধীনে উৎপাদককেই বর্জ্য আহরণের প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার বিষয়ে প্রণোদিত করার কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- অন্তর্ভুক্তিতার পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পথচারীবান্ধব বিশেষ উদ্যোগগুলোর ব্যাপারে প্রণোদনার বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার । কয়েকটি মাত্র উন্নত মানের বাস সার্ভিস চালু রেখে নগর পরিবহনে বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণের বাসযোগ্য নগর পরিবেশ তৈরির জন্য বিকেন্দ্রীকরণ এবং শহরমুখীতা কমানোর জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। রাজধানীর আশে পাশের শহরগুলোর সাথে উন্নত মানের দ্রুত কমিউটার রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে ঢাকায়, জনবসতির চাপ কমানো অনেকটাই সম্ভব হবে।

- নগরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যাগুলো দূর করা গেলে বায়ু দূষণ অনেকখানি কমানো সম্ভব। পথেঘাটে পড়ে থাকা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে কর্তৃপক্ষগুলো কাজ করলে সুফল পাবে। যেমন: এ কাজে প্রবীণ (অবসরপ্রাপ্ত) নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত করে সুফল পাচ্ছে জাপান। পাশাপাশি নগর ভিত্তিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচি চালু করার জন্য তরুণ শিক্ষার্থীদেরও যুক্ত করতে পারি। তাদের জন্য বিশেষ একটি প্রণোদনার ব্যবস্থা বাজেটে থাকতে পারে।

- উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় ধুলোবালির কারণে বায়ু দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হন নগরবাসী ও গাছপালা। নগারবাসিকে ধুলোবালি থেকে রক্ষা করতে এ ধরনের কাজ দিনের পরিবর্তে রাতে হতে পারে। আর গাছগুলো সকাল বেলায়ই ধুয়ে দিলে পাতার ওপর পড়ে থাকা ধুলোর সমস্যা সমাধান সম্ভব।

- বায়ু দূষণের মাত্রাটি সম্পর্কে নীতি-নির্ধারকসহ সকলকে সংবেদনশীল করতে ওয়ার্ডভিত্তিক Air Quality Index (AQI)-এর মাত্রা প্রতিদিন ডিজিটালি সকলকে জানানো গেলে সচেতনতা বাড়বে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসবাভিত্তিক উদ্যোগের আগ্রহও তৈরি হবে।

- দেশের মোট কার্বন নিঃসরণের ১৭ শতাংশই আসে ইটভাটা থেকে। তাই জল-জন-জমি-বায়ু দূষণকারি এই প্রচলিত ইটের বিকল্প হিসেবে কংক্রিট ব্লকের উৎপাদনে বিশেষ বরাদ্দ, ব্যবহারে বিশেষ প্রণোদনা (করছাড় হতে পারে) এবং ইটের ওপর ভ্যাটের পাশাপাশি বিশেষ ডিউটি আরোপ করা যেতে পারে।

- নগরে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বাঁচার তাগিদে আসা জলবায়ু শরণার্থীসহ যে প্রান্তজন কায়ক্লেশে জীবনযাপন করছেন, তাদের সন্তানদের জন্য কমিনিউটি ডে-কেয়ার সেন্টার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধেসহ সামাজিক সুরক্ষা কি করে বাড়ানো যায় বাজেটে তার স্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা উচিত।

শেষের কথা

বাজেটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ বাড়ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পঁচিশটি মন্ত্রনালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দে পরিবেশ সংরক্ষণে কী পরিমাণ খরচ হচ্ছে, তারও বিবরণ দেয়া হচ্ছে। নিশ্চয় এসবই পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এসব বরাদ্দ আখেরে কিভাবে, কতোটা সত্যি সত্যি খরচ হচ্ছে। প্রান্তজনসহ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার বিপন্ন মানুষের জীবনমান বাড়াতে এবং পরিবেশ-সম্মত জীবন চলায় এই বাজেট কতোটা সহায়ক হচ্ছে তারও একটি বিবৃতি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যুক্ত হলে ভালো হতো।

সবশেষে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুন্দরবনের ভূমিকা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ক'টি কথা দিয়ে শেষ করা যায়- "বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়ে যে সুন্দরবনটা রয়েছে। এটা হলো বেরিয়ার। এটা যদি রক্ষা না পায়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ– এ পর্যন্ত, নিম্নাঞ্চল এরিয়া সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং হাতিয়া সন্দ্বীপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায় তো সমুদ্র যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে, সে ভাঙ্গনে রক্ষা করার কোন উপায় আর নাই।"

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে "ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড"।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia